একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Ramapada Chowdhury's Short Stories: A Narrative of the Exploitation, Deprivation, and Resistance of the Lower Class People

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প: নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতিরোধের আখ্যান

Name of the Author: BIJOY BASAK

Affiliation: University of Gour Banga, Malda, West Bengal, India

Abstract: This study examines the representation of exploitation, deprivation, struggle and resistance of lower-class people in the short stories of Ramapada Chowdhury. Although primarily known for portraying middle-class life, Chowdhury's early stories vividly depict the harsh realities of the'subaltern', the paper explores how economic inequality, social hierarchy, and power structures lead to systemic oppression. Through close analysis of selected stories such as Manush Amanusher Galpo, Chandravasma,Imli, and Varatbarsha, the study highlight the lived experience of poverty, displacement, and dehumanization.The narratives reveal how lower-class individuals are often denied fair wages, dignity, and basic rights, while being subjected to exploitation by dominant social groups.However, alongside suffering, these stories also portray various forms of resistance both explicit and silent through which the oppressed assert their identity and humanity.Chowdhury's concise yet powerful storytelling brings out the intensity of these struggles without excessive dramatization.Ultimately, the paper argues that his works serve as a significant literary documentation of subaltern voices, reflecting both the vulnerability and resilience of marginalised people in modern Bengali society.

Keywords: Ramapada Chowdhury, Subaltern, Social hierarchy, Exploitation, Deprivation, Struggle, Resistance.

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প: নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতিরোধের আখ্যান

বিজয় বসাক

চল্লিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে রমাপদ চৌধুরীর আবির্ভাব। রমাপদ চৌধুরী এমন একজন লেখক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয় দেখেছেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিপর্যস্ত বিপন্ন অবস্থা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়াও শৈশবে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও কর্মসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসের নানান অভিজ্ঞতালাভ করেছেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের প্রাধান্য রয়েছে।

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কারা নিম্নবর্গের অধীন বা কাদের নিম্নবর্গ বলা হয় এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। 'নিম্নবর্গ'র সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 'Subaltern' (নিম্নবর্গ) শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির কারাগারের নোটবই-তে। মুসোলিনির কারাগারে বন্দী অবস্থায় গ্রামশি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বইটি লেখেন। **"সাবলটার্ন (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াট'-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্নশ্রেণি' হল শ্রমিকশ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণি বিপরীতমেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজি মালিক, 'বুর্জোয়াসি'।"**[১] সাবলটার্ন কথাটি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়। যেকোনো শ্রেণিবিভক্ত (বর্ণগত, লিঙ্গগত, সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,) সমাজে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। গ্রামশি তাঁর আলোচনায় অনেকক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলো সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রমাপদ চৌধুরী বাল্যকাল থেকেই তাঁর বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। আর এই ভ্রমণের সূত্রে কয়লাখনির কুলিকামিনদের জীবনযাত্রা যেমন দেখেছেন, তেমনি সাঁওতাল জনজাতির জীবনসংগ্রামও প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সাথে খানিকটা কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি লিখেছেন বিভিন্ন ছোটগল্প। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাঁদর মারার মতো এক বিচিত্র জীবিকা বেছে নিয়েছে পেটের দায়ে। এই বাঁদরমারার দলের মানুষদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মপ্রণালী, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা স্বীকার করেও মধ্যবিত্ত সমাজকর্তৃক তা দিতে অস্বীকার এবং নিম্নবর্গীয় সেই মানুষদের হিংস্র প্রতিবাদ নিয়ে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন 'মানুষ অমানুষের গল্প' গল্পটি। গল্পটির রচনাকাল ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, শারদীয়া 'দেশ'-এ প্রকাশিত। কৃষিনির্ভর গ্রামে বাঁদরের উৎপাতে ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ডাকা হয় বাঁদরমারার দলকে। শাঁখা ভাঙ্গা গ্রামে কালো চেহারা, হাতে উল্কি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের জনা পঁচিশেক নারীপুরুষের আগমন ঘটে বাঁদর মারার জন্য। আর এর বিনিময়ে তারা কাপড় আর টাকা নেয়। বাঁদর মারার দল সাত টাকা ও তিন জোড়া গামছা চাইলে গ্রামের লোকেরা দিতে অস্বীকার করলে দলের একজন বলে ওঠে - " - -

উ:, ভিখ মাগোন আইলাম গো। বলে মুখের ওপর একটা ঝামটা দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো টিকালী"।[২] অর্থাৎ তারা ভিক্ষার জন্য আসেনি, তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিকই চাইছে। পরবর্তীতে পঙ্খে মোড়লের নেতৃত্বে সাতটা টাকা নগদ ও তিনজোড়া গামছার বিনিময়ে তারা বাঁদর মারবে বলে ঠিক হয়। ভোর হতেই এরা দলে ভাগ হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে যায় তীর-ধনুক হাতে বাঁদর মারার জন্য। এইসমস্ত আদিবাসী মানুষেরা বাঁদর মারার পাশাপাশি বিভিন্ন জন্তুর চামড়া বিক্রি করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে - **"তীর মেরেই কাজ শেষ নয়, মরা বাঁদরগুলোকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙ করেছে বকুলতলায়, চাম ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়েছে, ঝোলায় ভরেছে। তারপর ডোম আর মুচি- মৃধাদের পাড়ায় গিয়ে হাঁক ধরেছে মেয়েগুলো: চাম লিবেগো চাম। বাঘের চাম, হরনের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম- লিবেগো "**।[৩]

নিম্নবর্গের এই মানুষদের বাস ছিল গ্রামের প্রান্তে খোলা আকাশে এক বকুলগাছের তলায়। সারাদিন গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাঁদরমারার পর রাতে মেয়েপুরুষেরা মিলে ইঁদুর, খাটাশ পুড়িয়ে খায়, সাথে থাকে হাঁড়িয়া। নেশা করে তারা একসাথে একদলা কেঁচোর মতো ঘুমিয়ে থাকে আর সকালে একদলা গুবরে পোকার মত উঠে বসে তাদের কাজে যায়। বাঁদর মারার দলের এক যুবতী মেয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে লজ্জাবোধ করে না অর্ধসভ্য গ্রামীণ মানুষেরা। টিকালীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সরলতার সুযোগ নিতে চায় হৃদয়, কিন্তু – **"টিকালীর রুক্ষ হাতে একটা চড় খেয়েছে রিদে কোটাল"**।[৪] নিম্নবর্গীয় টিকালী নিজের সম্মানরক্ষার্থে তার তুলনায় উচ্চবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনা। বাঁদর মারার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তারা তাদের কাজের প্রাপ্য মজুরি সাত টাকা ও তিনজোড়া গামছা নিতে যায়, তখন পঙ্খে মোড়ল তিন জোড়া গামছা দিতে অস্বীকার করে, সাত টাকার সাথে দু'জোড়া গামছা দিতে চায়। পূর্বে স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও কাজ শেষে যথাযথ পারিশ্রমিক না দেওয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সমাজকর্তৃক নিম্নবর্গীয় সমাজের শোষণ, আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় টিকালীর মতো সাহসী মানুষেরা। **"টিকালী একবার তাকালে মোড়লের দিকে, একবার রিদের দিকে, তারপ রহঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, মানুষ লও তুমরা"**।[৫] গ্রামের লোকেরা যখন বাঁদর মারার দলকে তাদের প্রাপ্য মজুরি দিতে অস্বীকার করে তখন বাঁদর মারার দলের মানুষেরা ভেবেছিল হয়তো হৃদয় কোটাল সত্য কথাটা বলবে। কিন্তু হৃদয় কোটালকে জিজ্ঞাসা করা হলে সেও বাবুমশাইরা যা বলে তাতেই সায় দেয়। এর ফলে নিম্নবর্গের এই মানুষদের মধ্যে জেগে ওঠে এক হিংস্র প্রতিরোধস্পৃহা যার ফলস্বরুপ তীরের আঘাতে হৃদয়ের হাত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে রক্তে মাটি ভিজে যায়। **"তারপর অসীম ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে একদলা থুতু ফেলে বললে বা-ন্-দ-র! খিলখিল করে লারী হেসে উঠল আবার। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকালীর কটা- কটা হিংস্র চোখ জোড়াও খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলে উঠল: বা- ন্-দ-র"**।[৬] রমাপদ চৌধুরী তাঁর ছোটগল্পগুলিতে অল্পকথার মাধ্যমে বিস্তৃত বিষয়কে বুঝিয়ে দেন। তাই তাঁর গল্পের মধ্যে যে সংগ্রাম প্রতিরোধের চিত্র আমরা পাই তা যেন আড়ম্বরপূর্ণ নয়। গল্পশেষে স্বল্পবাক্যে তিনি নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন, সেদিক থেকে রমাপদ চৌধুরী স্বতন্ত্র।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রাম শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত বা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, তাদের সংগ্রাম যেন ছিল নিজেদের জীবনের সংগ্রাম, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। অর্থলিপ্সু, আত্মমগ্ন, স্বার্থপর উচ্চবিত্ত মানুষদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে নিম্নবিত্ত মানুষেরা যেন পণ্যে পরিণত হয়। এমনই এক কাহিনি নিয়ে লেখা 'চন্দ্রভস্ম' গল্পটি, যেখানে মানুষকে ভিখারি বানিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। গল্পটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্প সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরী জানান- **"ভিখিরি তৈরি করার ব্যবসাটি সম্পর্কে জানতে পারি পুরীতে, গল্পে ঘটিয়েছি কলকাতায়। অর্থাৎ ব্যবসার স্বার্থে মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়াতেও বিবেককে আঘাত দেয় না"**।[৭] সমাজের দরিদ্র মানুষদের ভিখারি বানিয়ে সামান্য আহারে ও পশুর মতো বাসস্থানে আশ্রয়ের বিনিময় মূলচাঁদের মতো অর্থলিপ্সু মানুষেরা নিজেদের সম্পদ বাড়াতে সদাব্যস্ত থাকে। আর এই দরিদ্র মানুষেরা জীবনের সংগ্রামে পরাজিত না হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে এ কাজ করতে বাধ্য হয়। ভোরের আলো ফোটার আগে মোটর বাসে চাপিয়ে বিরাট এই শহরের অতিচঞ্চল জনারণ্যের মাঝে, পার্কে, সিনেমার দরজায়, কলেজের গেটে, মন্দিরে, দরগায় নামিয়ে দেওয়া হয় মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর জীবন্ত মুদ্রাচুম্বকদের। সামাজিক পরিচয়হীন এই ভিখারিরা সারাদিন ভিক্ষা করে দুপুরের মূলচাঁদের ঠিক করে দেওয়া এক সরাইখানায় পেটপুরে ডালভাত খায় গলায় ঝোলানো সংখ্যা চাকতি দেখিয়ে। তারপর আবার রাত দশটা পর্যন্ত ভিক্ষা করে মোটরগাড়িতে করে ফিরে আসে মূলচাঁদের আস্তানায়। জীবনসংগ্রামে হার না মানা এইসমস্ত নিম্নবর্গের মানুষের মনেও বিনোদনের ইচ্ছা জাগে। তাই তো মারোয়াড়ীর ভয়কে উপেক্ষা করে পিলুয়া ভিক্ষার পয়সা লুকিয়ে রেখে বায়স্কোপ দেখে। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও জৈবিক কামনা-বাসনা যেন তাদের মনে লিপ্ত থাকে। তাই যখন রাতের আঁধারে সবাই মিলে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে তখন পঞ্চা খুঁজে নেয় মাংনাকে। মাংনার বুকে হাত রেখে পঞ্চা তার শারীরিক তৃষ্ণা মেটায়। সনকাও আবার আদরের খোঁজে চলে যায় তাহিরের কাছে। আর এইভাবেই তাদের এই ছোট্ট দুনিয়ায় কেউকেউ গর্ভবতী হয়ে যায়। যেমন হয়েছে রাউতী। যদিও তাদের কোনো পিতৃপরিচয় থাকে না তথাপি মাতৃত্বের টানে রাউতী তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করতে চায়। আর এর বিনিময়ে সে অধিক পরিমাণে ভিক্ষা করে দেবে বলেও জানায়। মূলচাঁদ রাউতীকে স্বপ্ন দেখায় তার ছেলেকে ভদ্রলোকের মত পরিবেশে মানুষ করে চাকরি করাবে। জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে রাউতী। তার সন্তান যখন চাকরি করবে তখন তাকে আর ভিক্ষা করতে হবে না। আর এই স্বপ্ন দেখে হতভাগ্য নিঃস্ব মাতার সন্তানকে তুলে দেয় মূলচাঁদের হাতে। বিনিময়ে মূলচাঁদ ভদ্রলোকের মতো মানুষ করার পরিবর্তে তালাবন্ধ নিষিদ্ধ জগতে ভবিষ্যতের নতুন ভিখারি বানানোর ব্যবস্থা করে। **"ওরা মানুষ হচ্ছে। হাঁড়ির আকারের বড়ো বড়ো জালার ভেতরে বসে রয়েছে ওরা। হাঁড়ির কানাটা চেপে রয়েছে প্রত্যেকের কোমরে। কোমরের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটা বেড়ে উঠেছে ওদের নিয়মিত পানাহারে। শুধু কোমরের নিচের অংশটার নেই পরিবর্ধন। বারো বছর পরেও ওদের পা দুখানা থাকবে বারোমাসের শিশুর। লিকলিকে। অবশ নিম্নাঙ্গের জন্যে ওরা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু পথিকের করুণা উদ্রেক করতে পারবে।... মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর চামড়ার থলিটা জলভরা ভিস্তির মতো ফেঁপে ফুলে উঠবে"**।[৮] মূলচাঁদের মত অমানবিক,

অর্থলিপ্সু মানুষেরা নিম্নবর্গের মানুষদের চরম শোষণ ও বঞ্চনা করলেও সেই মানুষেরা জীবনযুদ্ধে হার না মেনে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করে বুনো মোষ, নীলগাই, বাঘ, ভালুক তাড়িয়ে চাষযোগ্য জমি প্রস্তুত করার পর ইজারাদারের কাছ থেকে চাষবাসের জমি লাভ করে একদল বেদে সম্প্রদায়। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে ইজারাদারকর্তৃক এই চাষবাসের জমি ছাড়তে বাধ্য করা হয় সমাজের নিম্নবর্গের এই মানুষদের। নিম্নবর্গীয় বেদে সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রাম নিয়ে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন 'ইমলী' গল্পটি। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ গল্পটির রচনাকাল। 'ইমলী' গল্প সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরী জানিয়েছেন – "**'ইমলি' গল্প অনেকের কাছে কটু স্বাদ দিয়েছিল। কিন্তু আমার গল্প তো অনেক সময়েই অস্বস্তিকর। দেশভাগের সময় শিয়ালদহ স্টেশনে দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখেছিলাম, দড়ি দিয়ে স্টেশনচত্বর দু'ভাগ করা হয়েছে, মাঝখানে যাত্রীদের যাতায়াতের পথ। আর একপাশে বিধ্বস্ত হিন্দুদের মুখেচোখে নিশ্চিন্তভাব, অন্যপাশে মুসলিম পরিবারের মহিলা শিশু এবং পুরুষ, যাদের মুখে চোখে ভীতি ও বিভ্রান্তি, এখান থেকে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। না লিখে পারিনি। ক্ষুধারও যে শ্রেণীবিন্যাস হয় তার আগে জানতাম না। নিরাপত্তার অভাব এবং ভয় যে মানুষকে কোন স্তরে নামিয়ে দেয় সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম।**"[৯] গল্পকার, ছিন্নমূল এই মানুষদের কথা-ই যেন তুলে ধরেছেন 'ইমলী' গল্পের ছিন্নমূল বেদে সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে মধু সংগ্রহ করে কলকাতা শহরের বুকে বিক্রি করতে আসে ইমলী তার দলের সাথে। রাতের অন্ধকারে ফুটপাতে শুয়ে থাকা বেদে সম্প্রদায়ের মানুষেরা তথাকথিত ভদ্রলোকের চোখে 'ময়লামানুষ' হিসেবেই পরিগণিত হয়। তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাবে ভদ্রলোকেরা তাদের বিদ্রুপ করে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়লেন – "**সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি কণ্ঠের প্রতিবাদ এল- আওরত দেখোনি কখনো; উল্লু কাহাকা**"।[১০] সারাদিন শহরের পথে ঘুরে মধু বিক্রি করতে গিয়ে বেদে মেয়ে ইমলী নিজেই যেন একটা সময় মধুর সন্ধান পেয়ে যায়। শহরের ফুটপাতে ফেরি করে বিক্রি করা বাসনওয়ালার সাথে প্রণয় হয় ইমলীর। ছিন্নমূল ইমলী বাসনওয়ালা ফালসার সাথে সুখে ঘরসংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষদের স্বপ্ন যেন চিরকাল অধরাই থেকে যায়। তাই বাসনওয়ালা ফালসার ঘরে ইমলী রাত কাটালেও তার সাথে ঘর সংসার বাঁধতে পারে না ইমলী। দিনের পর দিন ফালসার জন্য অপেক্ষা করলেও তার কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ওদিকে যাদের সাথে শহরে এসেছিল সেই দলের সকলেই দেশে ফিরে গেলেও ইমলী থেকে যায় প্রেমের টানে। কিন্তু ফাললসার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ইমলীকে চরম অসহায়ত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। অভাব ও খিদের জ্বালায় বাধ্য হয়ে একটা সময় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় ইমলীকে। কিন্তু অর্ধাহার আর অনাহারে ইমলীর শরীর কিছুদিনের মধ্যেই রোগা হাড়জিরজিরে হয়ে যায়। ফলে খরিদ্দার আর আকৃষ্ট না হলে ইমলী যেন জীবনযুদ্ধে হেরে যেতে বসে। এমন সময় একমুঠো খাবারের আশায় উদ্বাস্তুদের খাদ্যবিতরণের লাইনে দাঁড়ালেও খাদ্যের পরিবর্তে ইমলীর মেলে প্রহার। কারণ সেখানে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণিকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল। অর্থাৎ খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হচ্ছিল। ক্ষুধার্ত হওয়া সত্বেও আশ্রয়হীন বেদে যাযাবর ইমলীর খাবার মেলে না – " **– জোচ্চুরি করে খাবার মারতে এসেছে। - রিফিউজিরা খেতে পাচ্ছে না, শালী নেমন্তন্নবাড়ি ভেবে ছুটে এসেছে। - মেরে ভাগিয়ে দে মাগীকে**"।[১১] কোন রাজনৈতিক দল বা

সরকারের কোনপ্রকার মাথা ব্যথা নেই এই সমস্ত অসহায় দরিদ্র মানুষদের প্রতি। তথাকথিত ভদ্রসমাজকর্তৃক তারা লালসার স্বীকার হলেও কোন প্রকার সহায়তা পায় না। উত্তেজিত জনতার দল ইমলীকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে স্টেশনের বাইরে বের করে দেয় এবং যার যা মুখে আসছে নির্দ্বিধায় তারা বলতে থাকে। ইমলী হয়তো কিছুই বুঝতে পারে না। তার চোখ দিয়ে শুধু দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ে। জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত ইমলীর এই চোখের জল যেন উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতি তার তথা সমস্ত নিম্নবর্গের মানুষদের নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

পাহাড়ি টিলার পাদদেশে এক মাহাতোদের গ্রাম। গ্রামে মুরগি চরে বেড়াতো। মুরগি ও ডিম শনিচারীহাটে তারা বিক্রি করত। পাশাপাশি মাহাতোরা কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করত। চৌদ্দপুরুষের কৃষিজীবী এই মাহাতোদের জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভিখিরিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস নিয়ে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন 'ভারতবর্ষ' গল্প। গল্পটি 'দেশ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই গল্পের আখ্যান সময় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্ব ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ। রমাপদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ 'হারানো খাতা'য় বলেছিলেন – **"আমার কোনও অভিজ্ঞতা নিয়েই আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনও গল্প উপন্যাসলিখিনি, তিরিশ- চল্লিশবছরপরেওলিখেছি। 'ভারতবর্ষ' গল্পটি লিখেছিলাম প্রকৃত ঘটনার তিরিশ বছর পরে"।**[১২] এই গল্পটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্লিনটন বি সিলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটারারি অলিম্পিয়ানস সংকলনে ছাপা হয়েছিল। 'ভারতবর্ষ' গল্পের পাহাড়ি টিলার নিচে মাহাতোদের গ্রামেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ লেগে যায়। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ভয়ঙ্কর প্রভাবের ফলে দরিদ্র কৃষিজীবী মাহাতোদের জীবন একটা সময় বদলে যায়। মাহাতো গ্রামের পাশেই প্রতিদিন ট্রেন থামত যদিও সেটা কোন প্ল্যাটফর্ম বা সেখানে কোন টিকিটঘর নেই। ট্রেন থেকে নেমে যুদ্ধের সৈন্যরা সেখানে ব্রেকফাস্ট করত। দুটো সেদ্ধ ডিম এক মগ কফি, দু পিস পাউরুটি থাকত প্রত্যেকের জন্য। কাঁটাতারের পাশে ডিমের খোসা স্তূপীকৃত হয়ে পাহাড়ের মতো হতে থাকে, আর এর ফলেই রেলের লোকদের কাছে জায়গাটির নতুন নাম হয়ে গিয়েছিল 'আন্ডা হল্ট'। সৈন্যদের ট্রেন এসে দাঁড়ালেও প্রথম প্রথম পাহাড়ি টিলার নিচে বাস করা মাহাতোদের তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না সেদিকে, তারা নিজেদের কাজেই সবসময় ব্যস্ত থাকত – **"ওরা দিব্যি খেতে-খামারে কাজ করে, গুলতি নয় তো তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো টান-টান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি- পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ"।**[১৩] একদিন কাঁটাতারের বেড়ার ধারে নেংটি পরা দুটো ছোট ছেলে এসে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। সৈনিকের এক ধমকেই তারা ছুটে পালায় গ্রামের দিকে। কয়েকদিন পরে দেখা যায় কাঁটাতারের ওধারে শুধু বাচ্চা দুটোই নয়, পনের বছরের একটা মেয়ে দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ করে ট্রেন দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে একজন দুজন পাঁচজন দশজন করে মাহাতো গ্রাম থেকে ট্রেন দেখতে আসত গ্রামের প্রায় সকলেই। এইসমস্ত দরিদ্র মাহাতোদের তাচ্ছিল্যভাবে একজন সৈনিক পকেট থেকে চকচকে আধুলি বের করে ছুড়ে দিলেও মাহাতোরা সেটা কুড়িয়ে নেয় না। তারা একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে কোন কথা না বলে গ্রামে ফিরে যায়। নিম্নবর্গীয়দের প্রত্যাখ্যানের ভাষা যেন নীরবতা দিয়ে প্রকাশ করেছেন লেখক। রমাপদ চৌধুরীর তাঁর 'ফিরে আসা' গল্পটিতেও সাঁওতালদের যে প্রতিরোধের

কথা বলেছেন তা ছিল মূক প্রতিরোধ। এই গল্পটিতেও আমরা মাহাতোদের নিঃশব্দ প্রতিবাদ লক্ষ করি। কিন্তু তাদের এই প্রতিবাদ পরিণতিতে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই একটা সময় এক বৃদ্ধ মাহাতো ছাড়া সকলেই দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো কখন ট্রেন যাবে আর কখন ট্রেন থেকে সৈনিকেরা আনি দুআনি ছুড়ে দেবে – **"কাঁধে-স্ট্রাইভ তিন-চারটে আমেরিকান ততক্ষনে হিপপকেট থেকে মুঠোমুঠো আনি-দুআনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করেনি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল কারও, কারও বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল"।**[১৪] আমেরিকান সৈনিকেরা মাহাতোদের এই অবস্থা দেখে নিজেরা হাসাহাসি করত। মাহাতো গ্রামের এক বৃদ্ধ মাহাতো প্রথমে ঐ পয়সা প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীতে দেখা যায় যে তিনিও সাহেবদের কাছে হাত পেতে বকশিশ চাইছেন। জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া এইসমস্ত নিম্নবর্গের মানুষেরা যেন ক্রমশ ভিখারিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'চন্দ্রভস্ম' গল্পটিতে অর্থলিপ্সু ধনী ব্যবসায়ী দ্বারা কৃত্রিম ভাবে ভিখারি তৈরি করার যে প্রক্রিয়া তা তুলে ধরেছেন। সেখানে মূলচাঁদ মারোয়াড়ী শিশুদের পঙ্গু বানিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভিক্ষে কড়ায়। এই গল্পটিতেও আমরা পরোক্ষভাবে সেই ভিখারি বানানোর প্রক্রিয়া-ই দেখতে পাই – **"আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো- গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব- সব ভিখিরী হয়ে গেল"।**[১৫] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'ভারতবর্ষ' নামে একটি গল্প লিখেছেন। তাঁর 'ভারতবর্ষ' গল্প ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবাহক। কিন্তু রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্প হল জীবনসংগ্রামে হেরে যাওয়া নিম্নবর্গের কৃষিজীবী মাহাতোদের ভিখারিতে পরিণত হওয়ার কাহিনি। যা পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের ভিখারিতে পরিণত করার সমান।

রমাপদ চৌধুরী সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজের রূপকার হিসেবে অধিক পরিচিত। কিন্তু শৈশবের অভিজ্ঞতা এবং নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব তাঁর প্রথমপর্বের ছোটগল্পগুলিতে লক্ষ করা যায়। কয়লাখনির শ্রমিক থেকে কৃষিজীবী শ্রমিক সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত। তাদের এই সংগ্রামের পথ অনেকসময় সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত স্বার্থপর মানুষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর এর ফলে নিম্নবর্গের সেই মানুষদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রতিরোধস্পৃহা। রমাপদ চৌধুরী স্বল্পবাক মানুষ অল্পকথায় তিনি বিস্তৃত বিষয় ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর গল্পে আমরা নিম্নবর্গের মানুষদের যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখতে পায়, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে মূক প্রতিবাদ।

তথ্যসূত্র

১.ভদ্র, গৌতম, নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩।
২. চৌধুরী, রমাপদ, গল্পসমগ্র, আনন্দ, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩৮৪।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৭।
৪.তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৬।
৫.তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৮।
৬.তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯০।
৭.তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭৩।

৮.তদেব, পৃষ্ঠা ৪৪।
৯.তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭৩।
১০.তদেব, পৃষ্ঠা ২৬২।
১১.তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৮।
১২.চৌধুরী, রমাপদ, হারানো খাতা, দেশ পত্রিকা, ০২ জানুয়ারি থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ৭৭।
১৩.চৌধুরী, রমাপদ, গল্পসমগ্র, আনন্দ, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫৬৬।
১৪.তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬৯।
১৫.তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭০।